

❏ ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ৮. ৪. আনুগত্য বনাম ইবাদত

ইব্রাহিম অর্থ হুকুমদাতা বলে দাবি করার অপর দিক হলো হুকুম মানা বা আনুগত্য করাকেই ইবাদত বলে দাবি করা। প্রাচীন ও আধুনিক খারিজীগণ দাবি করেন যে, হুকুম প্রদানই উলূহিয়াত এবং হুকুম মানাই ইবাদত। কাজেই আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা ও আনুগত্য করা শিরক। এজন্য এ সকল কাফির সরকারের আনুগত্যকারী সকল নাগরিকই কাফির। তারা দাবি করেন যে, আনুগত্যই যে ইবাদত তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো ইব্রাহিম নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!”[1] এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহুদী-খৃস্টানগণ তাদের পন্ডিত ও দরবেশগণকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের ইবাদত করে। হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, তারা পন্ডিত-দরবেশদের পূজা-অর্চনা বা সাজদা-প্রার্থনা করে নি। বরং তারা তাদের আনুগত্য করেছে।

গুতাইফ ইবনু আইউন নামক দ্বিতীয় শতকের একজন প্রায় অজ্ঞাত- পরিচয় তাবি-তাবিয়ী বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুসআব ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (১০৩ হি) তাকে বলেছেন, সাহাবী আদী ইবনু হাতিম (রা) বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة براءة (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

“আমি শুনলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা তাওবায় পাঠ করছেন: ‘তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব-মালিক রূপে গ্রহণ করেছে’। তিনি বললেন, ইহুদী-খৃস্টানগণ তাদের (আলিম-দরবেশদের) ইবাদত করত না বটে, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কোনো কিছু হালাল করে দিত, তখন তারা তাকে হালাল বলে মেনে নিত। আর তারা যখন তাদের উপর কোনো কিছু হারাম করে দিত, তখন তারা তা হারাম বলে মেনে নিত।”[2]

ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে গুতাইফের সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ:

قلت يا رسول الله إنا لسن نعبدُهم فقال : أليسَ يحرمونَ ما أحلَّ اللهُ فتحرمونه ، ويحلُّونَ ما حَرَّمَ اللهُ فتحلُّونه ، قال : قلتُ : بلى ، قال : فتلكَ عبادتهم

“রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না! তিনি বলেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে বিশ্বাস কর না? আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এই তাদের ইবাদত করা।”[3]

তারা বলেন, এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে আনুগত্যই ইবাদত। আল্লাহর আইনের ব্যতিক্রম বা বিপরীত আইন প্রদানকারীর আনুগত্য করলেই শিরক হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, “এ হাদীসটি গরীব, ... গুতাইফ ইবনু আইউন হাদীস বর্ণনায় পরিচিত নয়।[4] এ অর্থে সাহাবীগণ থেকে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। হুযাইফা (রা), ইবনু আববাস (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, ইহুদী-খৃস্টানদের পণ্ডিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত। আর এ আনুগত্যই ছিল তাদের রব মানা।[5]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِجَادِلْكُمْ وَإِن
أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই ভক্ষণ করো না। তা অবশ্যই পাপ। শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমর তাদের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।”[6]

তাদের মতে এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আনুগত্যই শিরক; কারণ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা তাদের আনুগত্য করলে মুশরিক হয়ে যাবে। তাদের এ সকল প্রমাণের বিভ্রান্তি বুঝতে হলে কুরআনের আলোকে ইবাদতের অর্থ বুঝতে হবে। এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(ক) কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবাদত এমন একটি কর্ম যা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন বলে বিশ্বাস করাই শিরক। পরবর্তী অনুচ্ছেদে ‘তগুত’ বিষয়ক আয়াতগুলি থেকে আমরা জানতে পারব যে, ঈমানের ভিত্তিই হলো একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদতের যোগ্য বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা আছে তা অস্বীকার করা। সকল যুগে সকল নবী-রাসূল তার উম্মাতকে এ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। এজন্য বিভিন্ন শরীয়তে বিধি-বিধানের পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে কোনো পার্থক্য ছিল না। কোনো শরীয়তেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হয় নি। আল্লাহ ছাড়া কারো সম্মানে সালাত আদায়, অন্য কারো উদ্দেশ্যে কুরবানী, উৎসর্গ বা বলি দেওয়া, অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা, অন্য কারো উপর নির্ভর করা, পূজা-অর্চনা করা ইত্যাদি সকল শরীয়তেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আনুগত্যের অনুমতি ও নির্দেশ সকল শরীয়তেই প্রদান করা হয়েছে। আর যে কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তা সরাসরি ইবাদত হতে পারে না। তবে বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ বিশ্বাসের সাথে তা ‘ইবাদত’ বলে গণ্য হতে পারে।

(খ) ইবাদত শব্দটি আভিধানিকভাবে ‘আবদ’ বা ‘দাস’ শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে ‘উবুদিয়াত’ ও ‘ইবাদত’

দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবুদিয়াত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর ‘ইবাদত’ বুঝানো হয় অলৌকিক ও অজাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই ‘ইবাদত’ শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার ‘ইবাদত’ করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার সর্বময় বা বিশেষ শক্তি বা অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা কল্পনা করে তারই ইবাদত করে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ রাগিব ইসপাহানী (৫০২ হি) বলেন:

(العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الأفعال (الإفضال)

‘উবুদিয়াত (slavery, serfdom, bondage) হলো বিনয়-ভক্তি বা নিজের হীনত্ব-ছোটত্ব প্রকাশ করা। আর ইবাদত (worship, veneration) এর চেয়েও অধিক গভীর অর্থজ্ঞাপক। কারণ ইবাদত হলো চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় বা হীনত্ব প্রকাশ, যিনি চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা ও দয়ার মালিক তিনি ছাড়া কেউ এ চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন না।’[7]

অন্যান্য আলিমও অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায়:

العبادة على المعنى اللغوي غاية التذلل والافتقار والاستكانة

“ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয়, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব।”[8]

(গ) চূড়ান্ত বিনয়, অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করে চূড়ান্ত ক্ষমতা ও করুণার অধিকারীর জন্য যে কর্ম করা হয় তা বিভিন্ন পর্যায়ে। তার কাছে যেমন প্রার্থনা করা হয় তেমনি তার প্রশংসাও করা হয়। সবই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষ যা কিছু করে সবই ইবাদত বলে গণ্য। এজন্য ইবাদতের ব্যাখ্যায় বলা হয়:

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

“আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।”[9]

তবে সব কর্ম এক পর্যায়ে নয়। কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ‘ইবাদত’ হিসেবেই করে। যে সত্তার এরূপ চূড়ান্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য আছে তাকেই তা প্রদান করে। সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষই এগুলি জানেন। পূজা, অর্চনা, বলি, কুরবানী, মানত, প্রার্থনা ইত্যাদি এ জাতীয় কর্ম। এগুলি শুধু “আস্তিকগণ”-ই করেন, নাস্তিকগণ করেন না। “আস্তিক” ব্যক্তি তার বিশ্বাস অনুসারে যে সত্তার মধ্যে “অলৌকিক” বা ‘ঐশ্বরিক’ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করেন তার জন্যই করেন। এগুলি সবই “চূড়ান্ত ভক্তি” বা ইবাদত। পাশাপাশি কিছু কর্ম আছে যা মানুষ ইবাদত হিসেবে করে, আবার জাগতিকভাবেও করে। যেমন প্রশংসা করা, ভয় করা, আনুগত্য করা ইত্যাদি। এগুলি মানুষ জাগতিকভাবে অন্য মানুষের জন্য করে। আবার তার ‘মা’বুদ’ বা পূজিত সত্তার জন্যও করে। এ সকল কর্ম আস্তিক ও নাস্তিক সকলেই করেন। আস্তিক ব্যক্তি তার “উপাস্য”-কে উদ্দেশ্য করেও করেন আবার জাগতিক বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যেও করেন। নাস্তিক ব্যক্তি তার বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনদের উদ্দেশ্যে এ সকল কর্ম করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রথম প্রকারের কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করাই শিরক। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজদা, মানত, বলি, উৎসর্গ, জবাই ইত্যাদি করা। এগুলি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ কারো ভিতরে ঈশ্বরত্ব (divinity, holiness, sacredness, sanctity) ঐশ্বরিক ক্ষমতা, চূড়ান্ত আধিপত্য, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি কল্পনা না করলে কেউ তার জন্য এরূপ কর্ম করে না। তবে ঈমানের দাবিদার কেউ তা করলে তার কাজকে শিরক বা কুফর বলা হলেও তাকে সরাসরি কাফির বা মুশরিক বলা হবে না। বরং সে অজ্ঞতার কারণে, ভুল করে বা বাধ্য হয়ে করেছে কিনা জানতে হবে এবং তার ব্যাখ্যাই গৃহীত হবে।

(ঘ) পাশাপাশি অনেক কর্ম রয়েছে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে ইবাদত বলে গণ্য হলেও সাধারণ ভাবে ইবাদত নয়। আনুগত্য, ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি এ পর্যায়ের। ভয় আল্লাহর ইবাদত। কুরআন-হাদীসে বারংবার আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, উপরন্তু কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা শিরক। মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَخْضَعِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

“তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি মানুষদেরকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত।”[10]

কেউই কল্পনা করবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষকে ভয় করে শিরকে লিপ্ত হয়েছিলেন। বস্তুত, মানুষ প্রাকৃতিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিকে ভয় পায়। এতে শিরক হবে বলে বলে কেউ মনে করবে না। এমনকি মানুষের ভয়ে, অস্ত্রের ভয়ে বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করাকেও কেউ শিরক বলবেন না। সর্বোপরি মানুষের ভয়ে বা জীবন বাঁচাতে সুস্পষ্ট শিরক করলেও তাকে শিরক বলে গণ্য করা হবে না। ‘ভয়’ ইবাদত হওয়ার অর্থ হলো, শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের অলৌকিক, অপার্থিব বা ‘আল্লাহর মত অন্য কাউকে ভয় পাওয়া’ই শিরক বলে গণ্য হবে।

এ পর্যায়ের ভয় মূলত কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। ‘আল্লাহর মত অমুককে ভয় পাচ্ছে’ বললেই শিরক হয় না। বরং কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে ভয় পাচ্ছে তাই বিবেচ্য। মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে আল্লাহর মত অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, জাগতিক নিয়মের বাইরে অলৌকিকভাবে ইচ্ছা করলেই ভাল-মন্দ করতে সক্ষম অথবা বা কোনোভাবে আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক হবে। এ বিশ্বাসজাত ভয়ের কারণে যদি সে রাস্তার ডান থেকে বামে চলে যায় তবুও তা শিরক। আর যদি মানবীয় ভয়ের কারণে সে আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে শিরকে লিপ্ত হয়, তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

কাজেই ‘ভয়’-এর ক্ষেত্রে কর্ম নয় বিশ্বাসই বিবেচ্য। জবাই, উৎসর্গ, প্রার্থনা, সাজদা বা মানতের ক্ষেত্রে যেমন কর্মই মূলত শিরক প্রমাণ করে, ব্যাখ্যা তা দূরীভূত বা নিশ্চিত করে, ভয়-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্টা। কর্ম কখনোই

শিরক প্রমাণ করে না। কারো কোনো পরিমাণের ভয় দেখেই এ কথা বলা যায় না যে, লোকটির কর্ম শিরক, অথবা লোকটি কাফির বা মুশরিক। তবে যদি লোকটির বক্তব্য দ্বারা তার শিরকী বিশ্বাস প্রমাণিত হয় তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে।

(ঙ) ‘আনুগত্য’ও ভয়, ভালবাসা ইত্যাদি কর্মের মত কর্ম। কাউকে আল্লাহর মত চূড়ান্ত প্রশ্নাতীত সর্বময় আনুগত্যের যোগ্য ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার আনুগত্য করলেই শুধু তা শিরক বলে গণ্য হবে। মূলত বিশ্বাসই শিরক, কর্ম নয়। এইরূপ বিশ্বাস নিয়ে যদি কারো হুকুম মত ইসলাম-অনুমোদিত বৈধ কর্মও করে তবুও তা শিরক। আর যদি মানবীয় ভালবাসা, ভয়, লোভ ইত্যাদি কারণে কারো নির্দেশ মত আল্লাহর বিধানের বিরোধী কাজ করে তবুও তা শিরক বলে গণ্য হবে না। আমরা দেখেছি যে, এরূপ ভয়জনিত আনুগত্যের ভিত্তিতে শিরক বা কুফরী কর্মে লিপ্ত হলেও তা শিরক-কুফর বলে গণ্য হবে না।

(চ) ইহুদী-খ্রিস্টানদের আনুগত্য ছিল শিরক পর্যায়ে আনুগত্য। অতীতে এবং বর্তমানেও তারা তাদের পণ্ডিত, পাদরী, ধর্মগুরু বা পোপদের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক পবিত্রতা (divinity, holiness, sanctity) ও অত্রান্ততা (infallibility) বা ‘ইসমত’-এ বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, ধর্মগ্রন্থে কি আছে তা বিবেচ্য নয়, বরং পবিত্র-আত্মায় পূর্ণ হয়ে ধর্মগুরুগণ যা ব্যাখ্যা দিবেন তাই চূড়ান্ত। ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাসের সাথে পরিচিত সকলেই তা জানেন।

উপর্যুক্ত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের শিরক ছিল বিশ্বাসে, কর্মে নয়। পাদরী-পোপ যা হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা করত তারা তা হালাল বা হারাম বলে বিশ্বাস করত; কারণ তারা তাদের পবিত্রতায় (holiness, sacredness, sanctity) বিশ্বাস করত। এ ছিল তাদের শিরক। তারা সে হারামকে বর্জন করতো কিনা বা হালালকে পালন করতো কি না তা বিবেচ্য নয়।

এরূপ আনুগত্যের পাশাপাশি ইহুদী-খ্রিস্টানগণ ধর্মগুরু ও দরবেশদের ইবাদতও করত। তারা তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত, তাদের বর লাভের জন্য তাদের সাজদা করত, অনেকের মূর্তি বানিয়ে সেখানে মানত, উৎসর্গ, সাজদা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ইবাদত করত।

(ছ) শয়তানের বন্ধু বা মুশরিকদের আনুগত্যের বিষয়টিও একইরূপ। এখানে আনুগত্য কর্মে নয়, বিশ্বাসে। এখানে আনুগত্য হলো মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয়নি এমন পশুর মাংস ভক্ষণ করা হারাম। শয়তান তার বন্ধুদেরকে প্রেরণা দিল এ বিধান সঠিক নয় বলে প্রমাণ করে মুসলিমদের তাদের দলে নেওয়ার জন্য। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা নিজেরা যা হত্যা করি তা খাওয়া বৈধ আর আল্লাহ যা হত্যা করেন (স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে) তা খাওয়া অবৈধ হয় কিভাবে? এ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যা হত্যা করেছেন, অর্থাৎ যা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয় নি, বরং স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তা ভক্ষণ করা বৈধ। মুসলিমদেরকে আল্লাহ জানান যে তোমরা যদি তাদের এ মত মেনে নাও এবং মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ বৈধ বলে বিশ্বাস কর তবে তোমরাও তাদের মত মুশরিক হয়ে যাবে।

এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, কেউ যদি বাধ্য হয়ে, লোভে পড়ে বা অন্য কোনো কারণে কোনো কাফিরের নির্দেশ মান্য করে মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। এর অর্থ, কেউ যদি মুশরিকদের দলিল-প্রমাণ ও যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের মতটিকে সঠিক বলে মেনে নেয় বা তাদের ‘বিশ্বাস’ গ্রহণ করে তবে

বাস্তবে মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করুক অথবা না করুক সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।[11]

ফুটনোট

[1] সূরা তাওবা, ৩১ আয়াত।

[2] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৭৮।

[3] তাবারী, তাফসীর ১০/১১৪।

[4] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৭৮।

[5] তাবারী, তাফসীর ১০/১১৪-১১৫।

[6] সূরা আনআম, ১২১ আয়াত।

[7] রাগিব, ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩১৯।

[8] আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ৪/২৪৭; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/২২০; মুনাবী, ফাইদুল কাদীর ৩/৫৪০।

[9] উসাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, আল-কাওলুল মুফীদ ১/১৬।

[10] সূরা আহযাব, ৩৭ আয়াত।

[11] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৬৩; আবু দাউদ, আস-সুনান ৩/১০১, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১০৫৯; তাবারী, তাফসীর ৮/১৫-২১; ইবনু কাসীর, তাফসীর ২/১৭২, কুরতুবী, তাফসীর ৭/৭২-৭৭; হাসান হুদাইবি, দুআতুন লা কুদাত, পৃ. ১৫৫-১৬৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6920>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন